আমার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কথা : দেবেশ চন্দ্র সান্যাল (স্মৃতিচারণ)

0

BY সূর্যাক্ষর অ্যাডমিন ON JUNE 4, 2024 সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ

উনিশ শ’ একাত্তর সাল। পাকিস্তানি হানাদারদের অতর্কিত আক্রমনের কারণে দেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ ও দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। আমি তখন রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। ২৫ মার্চ’৭১ কাল রাত থেকে শুরু হলো পাকস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা। পাকিস্তানি হানাদারেরা বিশে^র জঘন্যতম এই নৃশংসতার নাম দিল ‘অপারেশন সার্চলাইট’। ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর চালালো বিনা বিচারে জ্বালাও, পোড়াও, নির্যাতন আর হত্যা। পাকিস্তানি হানাদারদের নৃশংসতার সংবাদ পেয়ে বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও শেষ বানী প্রদান করলেন। দেশ বাসীকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানালেন। জাতির পিতা বললেনÑ… দেশে একজন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে…। এই ২৫ মার্চ’৭১ এর পর

আস্তে আস্তে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা সারা দেশের অধিকাংশ জায়গায় ক্যাম্প করলো। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে হেরে যাওয়া জামায়াতে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা কর্মীরা পাকিস্তানের পক্ষ নিল।

পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের সহযোগিতার জন্য পীচ কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে তুললো। এ দেশের অধিকাংশ বিহারী অধিবাসিরা পাকিস্তানি সেন্যদের পক্ষ নিল। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছু বিহারী যুবকদের পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের শায়েস্তা করতে হবে বলে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দিয়ে এদেশে নিয়ে এসে ছিল।

পাকিস্তানি সৈন্যরা সারা দেশে ধর পাকড় করতো। পুরুষদের ধরলে জিজ্ঞাসা করতো, 'তুম মুসলিম হ্যাঁয়?' উলঙ্গ করে হিন্দু মুসলমান পরীক্ষা করতো। পুরুষদের বলতো, 'কাপড়া তোলো, চার কলেমা বাতাও।' লোকজনদের হিন্দুদেরকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাস করতো, 'মালাউন কাহা হ্যায়?।'

মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে জিজ্ঞাসা করতো, 'মুক্তি কাহা হ্যায়, মুক্তি কিধার চে আয়া, কিধার মে য্যায়া, মালুম ন্যাহী।' পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় সারা দেশ ব্যাপী জ্বালাও,পোড়াও, হত্যা, গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, জোর করে ধর্মান্তর করণ ও চাঁদা বাজি সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ করতে থাকলো। পাকিস্তানি বিহারী সৈন্যরা তাদের সাথে চাকরি করা বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে থাকলো। কিছু বাঙালি সৈন্য অস্ত্র নিয়ে অথবা খালি হাতে পালিয়ে এলেন। হানাদারেরা তাদেরই সাথী কিছু বাঙালি সৈনিক কে হত্যা করে ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগীতা করার জন্য জামায়াতে ইসলাম ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পীচ কিমিটি, রাজাকার বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে তুললো। পীচ কিমিটির লোক ও রাজাকারেরা পাকিস্তানি সৈন্যদের আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুদের বাড়িঘর চিনিয়ে দিত। পাকিস্তানি সৈন্যদের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে গ্রামে যেতো। তারা চিনিয়ে দিত কোন বাড়ির লোক মুক্তিযুদ্ধে গেছে। তারা পাকি হানাদারদের তথ্যদিত, বাড়িঘর লুটতরাজ, আগুন দিত ও চাঁদা বাজি করতো। তাদের এই নিষ্ঠুরতা দেখে জাতি স্বম্ভিত হয়ে পড়লো। প্রতিদিন পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতার কথা জানতাম বিভিন্ন মানুষ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে। তখন স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে চাকরি করা আমাদের এলাকার অধিকাংশ চাকুরী জীবী জীবন বাঁচাতে বাড়িতে বাড়িতে এসে অবস্থান নিলেন। তাঁদের কাছ থেকে ও অন্যান্যের কাছ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস ভয়াবহতার কথা জানতে পারলাম। উল্লাপাড়া থানার চড়িয়া ও কান সোনা ঘোষ পাড়া, সাথিঁয়া থানার ডেমড়া (বাউস গাড়ি রুপসী) ও করঞ্জা গণহত্যা হলো।

দেশের ভয়াবহ অবস্থা। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক এক রাতে এক এক গ্রাম ঘিরে রেখে ভোর থেকে গন হত্যা চালায়। এদেশীয় স্বাধীনতা বিরোধী সহযোগীদের দিয়ে লুটতরাজ চালায়। বাড়িঘর ও দোকানে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। ২৫ মার্চ কাল রাতের অপারেশন সার্চ লাইট এর পর থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুরা অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। বাঙালি সৈন্য, ই.পি.আর পুলিশ, আনসার ও অন্যান্যরা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালায়। তার পর জাতির পিতার নির্দেশ অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ চালায়। বাঙালি সৈনিক, ই.পি.আর, আনসার ও অন্যান্য প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এদেশের অধিকাংশ কৃষক, শ্রমিক,ছাত্র ও অন্যান্য নারী-পুরুষ। পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঙালিদের কুলিয়ে উঠা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রশিক্ষন, অস্ত্র ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য বাঙালি সৈন্য ও অন্যান্যরা ভারতে আশ্রয় নেয়। আমাদের গ্রামে করতোয়া নদী পাড় হয়ে আসতে হবে। নৌপথ ছাড়া গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা আসতে পারবেনা। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা খুব ভালো।

আমাদের গ্রামের সর্বজনাব ডা. মো. জয়নুল আবেদিন সরকার (জতু ডাক্তার), ভাইস প্রিন্সিপাল মো. নুরুল হক সরকার কেমিষ্ট মো. নজরুল ইসলাম সরকার, ডা.মো: খলিলুর রহমান ,মো: আব্দুল সরকার, মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন, মো. শাহ আলম মাষ্টার, মো. আব্দুল মজিদ সরকার, মো. আবুল কালাম, মো. আকবর আলী মোল্লা, মো. ইউনুস মাষ্টার,মো: আকবর আলী প্রামানিক সহ গ্রামের নেতৃস্থানীয় মুসলমান গণ মুসলমান যুবক ও সম্ভাব্য অন্যান্যদের ডেকে বললেনÑ “ সারা দেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা আপনারা সবাই জানেন। সারা দেশের যেখানে যাই হোক সবাই দেখবেন আমাদের গ্রামের হিন্দুদের যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। হিন্দুরা আমাদের আমানত...। আমরা আমাদের গ্রামের হিন্দুদের রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সতর্ক থাকবো”।

আমাদের গ্রামের একজন মানুষও পীচ কমিটির সদস্য, রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধী হয় নাই। সব মুসলমানেরা হিন্দুদের বিভিন্ন নিরাপত্তা দিয়ে ছিলেন। ডেমড়া গণহত্যা পর থেকে আমরা দিন রাত গ্রাম পাহাড়া শুরু করলাম। প্রতিবেশী মুসলমান যুবকেয়া আমাদের সহযোগিতার জন্য সাথে থাকলো। বড়দের নির্দেশে সর্ব মো. আব্দুল মজিদ, আবুল কালাম, গোলাম মাহবুব নান্নু, মো. আব্দুস ছাত্তার, মো. আনাইমোল্লা, মো. ইমান আলী, মো. নজরুল ইসলাম, মো. লাল মিয়া. মো. শামসুল হক ও অন্যান্যরা রাত দিন পালা করে করে আমাদের সাথে থেকে পাহাড়া দিল। আমাদের পরিবার কয়েক দিন রাতে প্রতিবেশী মুসলমানদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ঘুমাতাম। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা এত ভালো যে,তাঁরা আমাদের জন্য ঘর ও বিছানা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বারান্দায় ঘুমাতেন। আমরা কয়েক দিন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আমাদের গ্রাম অপেক্ষা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বাচড়া গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকলাম। একাকী মনে

মনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। মানুষের বাড়িতে আর কত দিন থাকা যায়। আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে আবার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলাম। আমাদের গ্রামের আমরা অন্যান্য যুবকেরা নিজেদের উদ্যোগে রাত দিন পালা করে করে গ্রাম পাহাড়া দিতে থাকলাম। আর মুক্তিযুদ্ধের যাওয়ার পথ খুঁজতে থাকলাম। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিক। দিনটি ছিল ৬ শ্রাবণ ১৩৭৮ ও ২৩ শে জুলাই'৭১ শুক্রবার। বর্ষাকাল। রাত ৮ টার দিকে দেখি আমাদের বাড়ির অদূরে পালেদের বিলে একটি ছই ওয়ালা নৌকা। নৌকা দেখে এগিয়ে গেলাম। বাচড়া গ্রামের আমার পরিচিত মো. আব্দুল ওহাব কে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাস করলাম। কী হবে? ওহাব বললো, এম পি এ. জনাব মো. আব্দুর রহমান স্যার এলাকার ইচ্ছুকদের মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এর জন্য ভারত নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বললাম তাহলে আমিও যাবো। আমি চলে এলাম বাড়িতে। গোপনে আমার জামা কাপড় গোছালাম তারপর আমার পড়ার খাতার একটি পৃষ্ঠা ছিড়ে মাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিরকুট লিখলাম। চিরকুট টি ছিল, 'মা, প্রণাম নিও, বাবাকে আমার প্রণাম দিও। বড় দাদা, মেজদাদা, ও বৌদিকে প্রনাম দিও। ছোট ভাই বোনকে স্নেহাশিষ দিও। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলাম। তোমাদেরকে বলে গেলে যেতে দিতে না এ জন্য না বলে চলে গেলাম। অপরাধ ক্ষমা করিও। আশীর্বাদ করিও। আমি যেন বিজয়ী হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি। ইতি, তোমার ছেলে, দেবেশ।

দিন টি ছিল আমাদের গ্রামের হাটবার। পিতৃদেব হাট থেকে ভালো মাছ এনেছেন, মাতৃদেবী রান্না করছেন। আর কিছু ক্ষণ পরেই আমাদের সবাইকে খেতে ডাকবেন। আমি বাড়ির কাউকে না বলে গোপনে নৌকায় গিয়ে বসলাম। রাত ৮-৩০ মি: এর দিকে শাহজাদপুরের রাজ্জাক ও এরশাদ ভাই সহ কয়েক জনকে সাথে নিয়ে একটা নৌকায় এম.পি.এ জনাব মো. আব্দুর রহমান স্যার এলেন। এম.পি.এ স্যার কে দেখে আমি দেখা করার জন্য এগিয়ে গেলাম। সামনে দাড়িয়ে আদাব দিলাম। আমাকে দেখে স্যার বললেনÑ দেবেশ, তুমি কেন?এত ছোট মানুষকে তো মুক্তিযুদ্ধে নিবেনা। আমি অনুরোধ করলাম। এম.পি.এ স্যার বললেন-ঠিক আছে চলো। তারপর রতন কান্দি পালেদের বিলের ঘাট থেকে রাত ৯-০০ টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। মানসিক ভাবে ভগবান কে প্রনাম করলাম। শুরু হলো এক কিশোরের জীবন পন যুদ্ধে যাওয়া। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বাড়িতে এসে জানতে পারলাম। আমার কারণে আমার বড় দাদা ও ছোট ভাই নৌকা ডুবিতে মরতে নিয়ে ছিল। আমি ভারতে উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আধা ঘন্টার পরই মাতৃদেবী আমাকে খেতে ডেকে ছিলেন। আমাকে না পেয়ে খোঁজা খুজি করে জানতে পেরে ছিলেন পালেদের বিলের খাট থেকে এক নৌকা মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিয়ে জন্য ভারতে রওয়া হয়েছে। মাতৃদেবী আমার জন্য কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন। তখন আমার বড় দাদা ও ছোটভাই গ্রামের জালাল কাকা সহ কয়েক জন কে একটা নৌকা নিয়ে আমাকে ফিরিয়ে আনাতে শাহজাদপুরে এম.পি.এ

সাহেবের বাড়িতে গিয়ে ছিলেন। ওখানে আমাকে পান নাই। ফিরে আসার সময় শাহজাদপুর করতোয়া নদীতে নৌকাটি ডুবে যায়। আমার ভাই ছোট হওয়ায় সবাই তাকে ধরে বাঁচাতে যায়। তখন আমার ভাই বলে – আমি সাঁতার জানি, আমার বড় দাদা সাঁতার জানেনা। আমার বড় দাদাকে বাঁচান। সবাই নৌকাটি উলটিয়ে আমার বড় দাদা ও ছোট ভাই কে বাঁচিয়ে ছিল।আমরা সুজানগর সাত বাড়িয়া হয়ে পদ্মা নদী পাড় হয়ে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার চিলমারি ইউনিয়নের খারিজাথাক গ্রাম দিয়ে বাংলাদেশের বর্ডার অতিক্রম করলাম। আমরা ভারতের পশ্চিম বাংলার জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। একটি বি.এস.এফ ক্যাম্পে ঢুকলাম। প্রাতঃক্রিয়াদি করে হাত মুখ ধুয়ে নিলামবি.এস.এফ ক্যাম্পেএম.পি.এ স্যার ও আমাদের গাইডার কে চেয়ারে বসতে দিলেন। আমাদের সবাই কে এক লাইনে দাড় করালেন। আমাদের গণনা করা হলো। আমরা হলাম ২২ জন। এম.পি.এ স্যার যোগাযোগ করে আমাদের কে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি ব্যবস্থা করলেন। এম.পি.এ স্যার আমাদের সাথে মালদহ পর্যন্ত গেলেন। মালদহ বাজার থেকে মুড়ি ও কাঠাল কিনে আমাদের খাওয়ালেন।

তারপর আমাদের কে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশে কোলকাতা চলে গেলেন। আমরা রাত ৯ টার দিকে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে পৌছালাম। তাঁরা আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পর দিন সকালে আমাদের সবাইকে ফলোইং করালেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে ট্রেনিং কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করলেন না। নিরুপায় হয়ে আমি আমার ওল্ড মালদহের পিশে মহাশয় বিশ^ানাথ ভট্টাচার্যের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তখন অধিকাংশ ভারতীয়রা বাংলাদেশের লোকদের কে জয় বাংলার লোক বলতো”।

ভারতের ট্রেন ও বাসে বাংলাদেশের লোকের কোন ভাড়া লাগতো না। বাস ও ট্রেনে ভাড়া চাইতে এলে ‘জয় বাংলা’ বললেই বুঝতে পারতেন আমরা বাংলাদেশের শরণার্থী। কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে একটি বাসে কাছাকাছির একটি রেল স্টেশনে গেলাম। তার পর ট্রেন ধরলাম। বারসই রেলওয়ে জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদলাতে হলো। আমি স্টেশনে বসে আছি। আমার কাছে ট্রেনের টিকেট নাই। মোবাইল কোর্টের লোক আমাকে ধরে নিয়ে গেল। একটি রুমে বসালো। যাদের ট্রেনের টিকেট নাই তাদের ম্যাজিস্ট্রেট এক এক করে ডেকে ডেকে জরিমানা করলো। পর্যায়ক্রমে আমার পালা এলো। আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম ‘জয় বাংলা’। ওনারা বুঝতে পারলেন আমি বাংলাদেশ থেকে গিয়েছি। আমাকে জরিমানা না করে ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী ট্রেনে উঠে ওল্ড মালদহ স্টেশনে নেমে পিসে মহাশয় শ্রী বিশ^ নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে গেলাম।

কয়েক দিন ওল্ড মালদহ, গাজল, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি আত্মীয় বাড়ি ঘুরলাম। আমার

পিশে মহাশয়ের ভগ্নিপতি ছিলেন একটি শরণার্থী ক্যাম্পের ইনচার্জ। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, 'তুমি ছোট মানুষ তোমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে শরণার্থী ক্যা¤েপ ভর্তি করে নিচ্ছি। তুমি রেশন ও অন্যান্য সকল সুবিধা পাবে।' আমি বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের জন্য ভারত এসে শরণার্থী শিবিরে বসে বসে খাবো ইহাতে সন্মত হতে পারলাম না। আবার ফিরে এলাম কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। আমাদের শাহজাদপুরের রবীন্দ্র নাথ বাগচী, মো. নজরুল ইসলাম ও রতন কুমার দাস সহ কয়েক জন কে পেলাম। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন তুমি মালঞ্চ (কুরমাইল) ক্যাম্পের ইনচার্জ ৭ নং সেক্টরের উপদেষ্টা বেড়া-সাঁথিয়া নির্বাচনী এলাকার এম.এন. এ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যারের কাছে যাও। আমি তাঁদের পরামর্শে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যার এর কাছে গেলাম। আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে কামাপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি করার ব্যাবস্থা করলেন। আমি কামাপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প ভর্তি কর্তৃপক্ষকে আমাকে ভর্তি করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমার দেশ প্রেম, সাহসী মনোভাব ও অন্যান্য শুনে ভর্তি করলেন। প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের ফলইং করিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো,পিটি প্যারেড করানো হতো। কদিন কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার পর আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগচী, রতন কুমার দাস ও মো. নজরুল ইসলাম কে ট্রান্সফার করলো মালঞ্চ ট্রানজিট ক্যাম্পে, তারপর মালঞ্চ থেকে কুড়মাইল ট্রানজিট ক্যাম্পে। কুড়মাইল থেকে আমাদের কে আনা হলো পতিরাম ক্যাম্পে।

পতিরাম ক্যাম্প থেকে এক যোগে ভারতীয় আর্মি লরিতে ২০/২২ জন কে নিয়ে আসা হলো দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা নামক ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পে। প্রশিক্ষন শুরুর দিনে প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর প্রথমে ফলইন করিয়ে প্রশিক্ষনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ও অন্নান বিষয়ে বললেন। তারপর তিনি বললেন দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান ডি এস ভিলন স্যার আসবেন। ঠিক দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষন প্রধান শিখ সেনা ক্যাপ্টেন ডি এস ভিলন স্যার এলেন। তিনি আমাদের সকল কে উদ্দেশ্য করে হিন্দিতে যা বললেন তার অর্থ হলো-"... আপনাদের কে স্যালুট। আপনারা বীর, আপনারা আপনাদের দেশ মাতাকে হানাদার মুক্ত করতে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আমরা আপনাদের জন্য তেমন কিছু করতে পারবো না। আমরা মানবিক সহায়তা, প্রশিক্ষন ও অস্ত্র দিব। আপনাদের দেশকে আপনাদেরই স্বাধীন করতে হবে। আপনাদের জন্ম দাতা পিতা মাতাকে স্যালুট জানাচ্ছি। তাঁরা দেশের জন্য তাঁদের সন্তানদের কে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন...।

পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প টি ছিল ভারতের শিলিগুড়ি মহকুমার ৭ নং সেক্টরঅধীন। পানিঘাটা স্থান টি ছিল চারি দিকে পাহাড়ের মধ্যে। এই বনাঞ্চলে বনমানুষ, নকশাল ও অন্যান্য খারাপ

মানুষের বসবাস ছিল। স্থানটি ছিল কার্শিয়ান পাহাড় হইতে নেমে আসা একটি ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শে¦র বনাঞ্চল। চাঁন মারি স্থানের বামপাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণার জল। ক্যাম্পে নিয়ে আমাদের তাবুর মধ্যে থাকার সিট করে দিল। আমাদের প্রত্যেক কে একটা মগ, একটা প্লেট, দুই টা প্যান্ট, ২টা গেঞ্জি, একটি মশারি, ও বিছানা পত্র দেওয়া হলো। ট্রেনিং শুরু হলো। আমাদের ২৮ দিনের ট্রেনিং হলো। আমাদের কে থ্রিনট থ্রি রাইফেল, এল, এম,জি,এস,এল,আর, ষ্টেনগান, টুইঞ্চ মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ, এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার, ফাষ্ট এইড সহ অন্যান্য ট্রেনিং দিল। যুদ্ধে সহযোদ্ধা আহত হলে বা শহীদ হলে করণীয় সর্ম্পকে এবং ফাষ্ট এইড সম্পর্কে ধারণা দিল। ভারতীয় কয়েক জন হিন্দু বিহারী ও শিখ সৈন্য প্রশিক্ষন দিলেন আমাদের কোম্পানীর। আমাদের কোম্পানীর নাম ছিল ডেল্টা কোম্পানী। প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন শিখ সেনা ডি.এস. ভিলন। এফ.এফ ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিদায়ের পূর্বে শ্লেটে চক দিয়ে এফ.এফ নম্বর লিখে বুকের উপর ধরিয়ে ছবি তোলা হতো। কিন্তু আমাদের কোম্পানীর প্রশিক্ষনার্থীদের বিদায়ের পূর্বে কদিন ধরে বৃষ্টি হলো। আবহাওয়া জনিত কারণে আমাদের ছবি তুলতে পারলেন না। বিদায়ের সময়ে জানতে পারলাম আমার এফ.এফ নং-৪৭৪২। ট্রেনিং শেষে ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রাক যোগে আমাকে, রবীন্দ্রনাথ বাগচী, মো. নজরুল ইসলাম ও রতন কুমার দাস ও অন্যান্য প্রায় ৫০ জন কে নিয়ে আসা হলো ৭ নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার তরঙ্গপুরে। ইহা ছিল পশ্চিম বঙ্গেরকালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুর নামক স্থানে অবস্থিত। তরঙ্গপুর এনে সিরাজগঞ্জ জেলার ৮০ জনের সমন্বয়ে একটি গেরিলা গ্রুপ করা হলো। আমাদের গ্রুপের গ্রুপ লিডার নিযুক্ত হলেন বেলুকুচি থানার তামাই গ্রামের জনাব এম.এ মান্নান। ডেপুটি লিডার নিযুক্ত হলেন শাহজাদপুর থানার জামিরতা গ্রামের অধিবাসী বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী। আমাদের কে তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, রেশনিং ও পকেট মানি দেওয়া হলো। আমার নামে একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এক ম্যাগজিন গুলি, একটি বেওনেট ও একটি হেলমেট ইস্যু করা হলো। অন্যান্য গোলা বারুদ, মাইন,গ্রেনেড ও এক্সপ্লোসিভ কমান্ডার স্যারের দায়িত্বে কাছে দিলেন। মৃত্যু যে হবেনা এমন কোন গ্যারান্টি ছিল না। তাই আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি ও যুদ্ধ জয়ের জন্য তরঙ্গপুর বাজার থেকে একখানা শ্রী শ্রী চন্ডী গ্রšʼ, একটি বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও একটি ৪ ব্যান্ডের রেডিও কিনলাম। তরঙ্গপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত বাসে এসে ট্রেনে উঠলাম। শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংসন ষ্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন বদলাতে হলো। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্লাট ফরমে গ্রুপের সকলের সাথে বসে আছি। দেখলাম আমাদের প্লাট ফরমের সামনের লাইনে একটা ফাঁকা ট্রেন দাড়িয়ে আছে। আমি প্রস্রাব করার জন্য ট্রেনের একটি বাথরুমে ঢুকলাম। এমন অবস্থায় ট্রেনটি স্টার্ট করলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াগুড়া করে বাথরুম থেকে বের হয়ে লাফ দিয়ে প্লাট ফরমের উপর নেমে পড়লাম। আমার হাটুতে ব্যাথা লাগলো। আজ ভাবি-তখন পকেটে কোন আইডি কার্ড ছিল না।

আমার অপরিচিত জায়গা। ওখানকার একজন মানুষও আমাকে চেনে না। আমি মারা গেলে আমার সাথীরাও আমাকে খুঁজে পেতেন না। আমার লাশ কবর হতো কী দাহ হতো নিশ্চয়তা ছিল না। আমার বাবা-মা সারা জীবন আমার পথ পানে চেয়ে থাকবেন। আমার লাশ টাও পেতেন না।

পরে ট্রেন বদলীয়ে আসাম গামী ট্রেনে উঠলাম। আসাম গামী ট্রেনে ধুপরী নামক ষ্টেশনে আমরা নামলাম। তারপর বাস যোগে মানিকার চর এলাম। রাত হয়ে যাবার কারণে রাতে মানিকার চর একটা ভাড়া বডিং এ থাকলাম। পরদিন সকালে মানিকার চর থেকে নদী পার হয়ে এলাম তদানীন্তন রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মুক্তাঞ্চলে স্থাপিত রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। রৌমারী ক্যাম্পে আমরা স্নান খাওয়া দাওয়া করলাম। আমাদের কমান্ডার স্যার সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তাঞ্চল যমুনার চড়ে পৌঁছানোর জন্য একটি বড় ছই ওয়ালা নৌকা ভাড়া করলেন। রৌমারী ক্যাম্প থেকে রাতের খাবার খেয়ে রাত ৯:০০ টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। ইহা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর'৭১। নৌকা বাহাদূরাবাদ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট কাজিপুর থানা ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে আসতে হয়। আমরা জানতে পেরে ছিলাম। বাহাদূরাবাদ ঘাট অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা। ঐ ক্যাম্পের পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা ভয়ানক। তারা স্পীড বোট নিয়ে রাতে নদী টইল দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা পেলে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। আমাদের কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার নির্দেশ দিলেন, 'আপনারা সবাই নৌকার ডওরার মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকুন। পাকিস্তানি হানাদারেরা ধরতে এলে আমরা ধরা দিব না। যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ করে শহীদ হবো কিন্তু ওদের হাতে ধরা দিব না।'

রাত ২.০০ টার দিকে আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করতে থাকলাম। ওদের সার্চ লাইটের আলো এসে বার বার আমাদের নৌকাতে পড়ছিল। ভগবানের কৃপায়-ওরা আর স্পীড বোট নিয়ে ধরতে এলোনা। আমরা বাহাদূরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করলাম। আমাদের সাথে চিড়া গুড় ছিল। ভোরে মাঝিরা এক কাইসা খেতের মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দিল। আমরা নীচে নেমে খেতের মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করলাম। আমাদের সাথে থাকা চিড়া ও গুড় দিয়ে সকালের জলখাবার খেলাম। তারপর নৌকা আবার ছাড়লো। তখন কাজিপুর থানার অধিকাংশ এলাকা সহ বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে। কাজিপুর থানার সম্মুখ দিয়ে আমাদের নৌকা আসবে।

দেখে শুনে খোঁজ নিয়ে থামিয়ে থামিয়ে ৪ দিন ভরে নৌকা এসে পৌছালো সিরাজগঞ্জ হানাদার মুক্তাঞ্চল যমুনার চরে। ইহা ছিল টাঙ্গাইল জেলার সিংগুলির চড়েরনিকটবর্তী। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা ছিল। মাঝিরা কোন রকমে ডালভাত অথবা খিচুড়ি রান্না করে আমাদের খাওয়াতো। এই

ভাবে খেয়ে না খেয়ে চলছিলাম। পরদিন রাতে যমুনা নদীর এপাড়ে চলে এলাম। চলে এলাম বেলকুচি-কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকার এম.এন.এ জনাব মো. আব্দুল মোমিন তালুকদারের গ্রামের বাড়িতে। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ভাই মো. রশিদ তালুকদার আমাদের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করলেন। অক্টোবর'৭১ মাসের মাঝা মাঝির আগ পর্যন্ত আমাদের গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা কম থাকায় সম্মুখ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত কমান্ডার স্যার নেন নি। কমান্ডার স্যারের কাছে জানলাম জনাব মো. আমির ভুলু এর গ্রুপ আমাদের এই এলাকাতেই আছেন। আমরা পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও তাদের দোসরদের আতঙ্কে রাখার জন্য গেরিলা কার্যক্রম 'হিট এন্ড রান' চালাতাম।
পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার ক্যাম্পের নিকট বর্তী গিয়ে ২/৪ টা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের আকাশ মুখি ফাঁকা গুলি ছুড়ে চলে আসতাম। পাকিস্তানি দালাল, পীচ কমিটির লোক ও অন্যান্যরা আমাদের আমরা যে আশে পাশে আছি জেনে ভয় ও আতঙ্কে থাকত। আমরা দিনের বেলা স্কুলে বা কারো বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ছিল দুইটি পক্ষ। একটি স্বাধীনতার পক্ষে। অন্যটি স্বাধীনতার বিপক্ষে। আমাদের কার্য এলাকার অধিকাংশ মানুষ ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। স্বাধীনতার বিপক্ষের পীচ কমিটির সদস্য,রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্যরা।
স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারীদের তথ্য দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে এসে বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ,চাঁদাবাজি করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দাতা বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করতো। হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতারা ছিল ওদের বড় টার্গেট। হিন্দু নারী পুরুষকে ধরে নিয়ে যেত। নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা করতো। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারাও পাকিস্তানি হানাদার পক্ষ ত্যাগ ও তাদের সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ ভাবে অত্যাচারী পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকারদের হত্যা করতো। গণহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী কাজে সরাসরি জড়িত কোনপাকিস্তানি হানাদার সৈন্যকে ধরতে পারলে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে বিচার করার পরিকল্পনা ছিল। যে কারণে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে সাহসী একজন কে জল্লাদ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। আমাদের গ্রুপের জল্লাদ হিসেবে মনোনীত ছিলেন দৌলতপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মো. শামসুল হক।
আমরা এমন কোন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ধরতে পারি নাই। আমরা কখনো কাউকে মারি নাই। আমাদের গ্রুপের নীতি ছিল, 'আমরা আমাদের দেশী কোনো ভাই কে হত্যা করব না। বুঝিয়ে তাদের কে স্বাধীনতার পক্ষে আনবো।' যে কারণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কোন স্বাধীনতা বিরোধীকে ধরি নাই, অত্যাচার বা হত্যা করি নাই। আমরা নিজেরা বা তাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে বিভিন্ন ভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বাধীনতার পক্ষে আনার চেষ্টা

করতাম। আমাদের হাতে আগ্নেয় অস্ত্র থানা সত্বেও আমরা প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্কে থাকতাম। যে কোন সময় পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের আক্রমন করতে পারে। আমাদের থাকা খাবার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা আজ এ শেল্টারে কাল সে শেল্টারে থাকতাম। কোন শেল্টারেই একাধিক দিন থাকতাম না। কোন কোন দিন শেল্টারের অভাবে সারারাত চিড়া গুড় খেয়ে রাত্রি জেগে স্কুলের বেঞ্চে শুয়ে থাকতে হতো। কি যে অমানবীয় কষ্ট।

আমাদের শেল্টার পালা ক্রমে আমরা দু'জন করে করে পাহাড়া দিতাম। প্রতি রাতে কমান্ডার স্যার আমাদের পাশ ওয়ার্ড দিতেন। আমরা আমাদের শেল্টার ডিউটি দেওয়ার সময়ে কোন লোক এলে 'হল্ট' বলে দাড় করাতাম। তারপর 'হ্যান্ডস আপ' বলে হাত উপরে উঠাতে বলতাম। তার পর জিজ্ঞাসা বাদ করে নিশ্চিত হয়ে যেতে দিতাম। আমরা রাতে বিভিন্ন রাজাকারদের বাড়িতে গিয়ে তাদের বুঝাতাম। সকালে আমরা অস্ত্রে ফুল থ্রু মারতাম, পরিস্কার করতাম ও অস্ত্রে তেল দিতাম। তখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। আমরা একেক দিন একেক জনের বাড়িতে খাওয়া – দাওয় করতাম। স্বাধীনতা বিরোধীদের ভয়ে অনেকে আমাদের কে শেল্টার বা খাবার দিতে সাহস পেতেন না। কারণ অধিকাংশ গ্রামেই ছিল ২/৪ জন করে পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকার। তারা খোঁজ জানলে পাশর্^বর্তী আর্মি বা রাজাকার ক্যাম্পে সংবাদ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিবে, বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে হত্যা করবে ও অত্যাচার চালাবে এই ছিল তাদের ভয়।

আমাদের সাথে সব সময় চিড়া গুড় থাকতো। স্থানীয় কিছু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ায়ে আমাদের সাথে নিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবার কারণে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী পাগল প্রায় হয়ে গিয়ে ছিলেন। একটি অবুঝ কিশোর ছেলের পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! আমাকে খুঁজে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ও রাজাকারদের আলটিমেটামে গণহত্যার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গোটা পরিবার বাড়িঘর সবফেলে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে ভারতের আসামের মানিকার চড় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। কোথায় ও আক্রমণের পূর্বে আমরা রেকী করে দেখতাম।

'জয় বাংলা' ছিল আমাদের রণাঙ্গণের প্রধান ধ্বণি। আমি আমার গ্রুপ কমান্ডার ও রণাঙ্গণের সাথিদের বলে রেখে ছিলাম, 'আমি রণাঙ্গণে মারা গেলে, তরঙ্গপুর বাজার থেকে কেনা জাতীয় পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে আমার দেহ নদীতে দিয়ে দিবেন।' মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে আমি মারা গেলে তখন বাংলাদেশে আমার লাশ নিয়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করার মত পরিবারের কোন লোক ছিল না। রনাঙ্গনে মারা গেলে লাশ নিয়ে গ্রামে যাওয়ারও অবস্থা ছিলনা। আমি দুই জন গ্রুপ কমান্ডাররের অধীনে সম্মুখ/ গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। এক- গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান এবং দুই ডেপুটি গ্রুপ কমান্ডার (গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী এর

কমান্ডানাধীনে। গ্রুপ কমান্ডার এম.এ মান্নান স্যার এর অধীনে বেলকুচি থানা আক্রমন যুদ্ধ ও কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন এ্যাম্বুস। বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীনে কল্যান পুর ও ধীতপুর যুদ্ধ। আমাদের গ্রুপের গেরিলা/সম্মুখ যুদ্ধগুলো হলোঃÑ

১। বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ: বেলকুচি সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য থানা। অক্টোবর'৭১ মাসের শেষের দিকে আমরা এই থানা আক্রমণ করেছিলাম। এই থানা আক্রমণ যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন আমাদের গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার।কমান্ডার স্যারের ও আরো ৩ জনের রেকিতে একযোগে বেলকুচি থানা ও বেলকুচি মুসলিমলীগ নেতা মো. আব্দুল মতিনের বাড়ি আক্রমন করলাম। সন্ধ্যায় বানিয়া গাতি গ্রামের এক বাড়ির শেল্টারে কমান্ডার স্যার বিস্তারিত ব্রিফ করলেন। আমাদের দুই গ্রুপে ভাগ করে দিলেন। সিদ্ধান্ত হলো কমান্ডার স্যারের নেতৃত্বে বড় গ্রুপটি থানা আক্রমন করবে। অন্য গ্রুপটি রবীন্দ্র নাথ বাগ্চীর নেতৃত্বে মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমন করে মতিন সাহেবকে ধরে আনবে। আমি কমান্ডার স্যারের গ্রুপে থেকে থানা আক্রমন যুদ্ধে অংশ নিলাম। রাত ৯ টায় বানিয়া গাতি থেকে যাত্রা করলাম। থানার কাছে গিয়ে দু গ্রুপ টার্গের উদ্দেশ্যে ভাগ হলাম। নিদিষ্ট সময়ে রাত ১২টায় একযোগে আক্রমনের সিদ্ধান্ত।

পরিকল্পনা মোতাবেক থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে ক্রোলিং করে থানার সামনে যেতেই সেন্ট্রি দেখে ফেললো। হুইসেল বাঁজিয়ে থানার সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমাদের কে লক্ষ্য করে গুলি করলো। আমাদের কমান্ডার স্যার কমান্ড করে ফায়ার ওপেন করলেন। আমরা সবাই একযোগে গুলি করলাম। এক ঘণ্টা ব্যাপি যুদ্ধ চললো। ভয়া বহ যুদ্ধ। আমার মাথায় হেল মেট। দুইটি গুলি এসে হেলমেটে লাগলো। আমার ডান পার্শে^ আমার কমান্ডার। হয় বিজয় আর না হয় মৃত্যু ছাড়া কোন পথ নাই। বৃষ্টির মত গুলি চালিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধের সময়ে এক সময়ে কমান্ডার স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেবেশ মাথা তুলো না, গুলি চালিয়ে যাও।' আমাদের বৃষ্টির মতো গুলিতে থানার বিহারী পুলিশ ও রাজাকার থানার পিছনদিক দিয়ে পালিয়ে সোহাগপুর যমুনা নদীতে থাকা একটি লঞ্চে চড়ে আমাদের রেঞ্জের বাইরে যমুনার মধ্যে চলে গেল। থানার সেন্ট্রি গুলি করা বন্ধ করে উ”চ স্বরে সারেন্ডার,সারেন্ডার বলে দুই হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করলো। আমরা থানার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আমরা থানার মাল খানা থেকে সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিলাম। থানার দু'জন রাজাকারকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে এলাম।ভোর হয়ে গেল। মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমন করা দলটিও এলো। মতিন সাহেব পালিয়ে গেছে। তাকে ধরা সম্ভব হয় নাই। থানার আশেপাশের লোকজন দোকান ও বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিল। বিজয়ী হয়ে কিছু সময় বিজয় উল্লাস করলাম তারপর চলে এলাম।রাজাকাররা যাতে আমাদের শেল্টার চিনতে না পারে সেই জন্য তাদের চোখ বেঁধে শেল্টারে ঢুকলাম। পরদিন সিরাজগঞ্জ থেকে শতাধিক পাকি

হানাদার সৈন্য ও রাজাকার এসে থানার আশে পাশে আগুন দিয়েছিল এবং মানুষদের নির্যাতন করেছিল।বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধে আমরা ২ জন রাজাকার কে ধরে এনেছিলাম। রাজাকার২ জন কে চোখ বেঁধে আমাদের শেল্টারে আলাদা রুমে রেখে ছিলাম। তাদের কে চোখ বেঁ◌েধ পাশের রুমে রাখা হয়েছিল। আমি কমান্ডার স্যারের অনুমতি নিয়ে ওদের সাথে কথা বার্তা বললাম। তাদের কে রাজাকার হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম ও শুনলাম। ওদের সাথে জিজ্ঞাসা বাদে মনে হলো ওরা সহজ সরল ও অভাবী মানুষ। ওদের বাড়িতে স্ত্রী ও পুত্র কন্যা আছে। পীচ কমিটির লোকদের কথায় বিশ^◌াস করে ওরা রাজাকার হয়েছে। ওরা মনে করে ছিল এটা একটা চাকুরী। উপার্জন করে সংসার পরিচালনার জন্য ওরা রাজাকার হয়েছে। তারা বলল আমরা কাউকে কোনো অত্যাচার করি নাই। কোনো বাড়িঘর লুটতরাজ করি নাই। পাকিস্তানি হানাদের নিয়ে এসে কোনো গন হত্যা করি নাই। কোনো বাড়িতে আগুন দেই নাই...। তাদের কথায় আমার মায়া হলো। আমি তাদের চোখ বাঁধা খুলে দিলাম। তাদের কে বিভিন্ন ভাবে বুঝালাম। প্রতিজ্ঞা করালাম তারা আর রাজাকারে যাবে না। রাত্রিতে শেল্টার পরিবর্তনের সময় কমান্ডার স্যারে কে অনুরোধ করে রাজাকার দুই জনকে ছেড়ে দিয়ে ছিলাম।
২। কালিয়া হরিপুর রেলওয়্রে ষ্টেশনে পাকিস্তানি সৈন্য ও ব্রীজ পাহাড়ারত রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করার জন্য এ্যাম্বুস। কালিয়া হরিপুর সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার একটি রেলওয়ে ষ্টেশন। এই এ্যাম্বুসের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার। ৪ নভেম্বর’৭১ আমাদের গ্রুপের ঝাঐল গ্রামের সিরাজগঞ্জের এম, এন, এ জনাব মো. মোতাহার হোসেন তালুকদারের ভায়রা আওয়ামীলীগ নেতা জনাব মো. আব্দুল হামিদ তালুকদারের রেকির ভিত্তিতে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে পাকিস্তানি সৈন্য ও ব্রীজ পাহাড়ারত রাজাকারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করা জন্য অ্যাম্বুস করেছিলাম।
কালিয়া হরিপুর যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমার রণাঙ্গনের সাথি জনাব মো. আব্দুল হামিদ তালুকদার সাহেব আমাকে বললেন, ‘দেবেশ, মানিকাচর তোমার বাবা-মা সহ পরিবারের সবার সাথে দেখা করেছি। সবাই ভালো আছেন। তোমার রেশন ও পকেট মানির টাকা তোমার আব্বার হাতে দিয়ে এসেছি। তোমার এক ভাই আমার সাথে এসেছে। তাকে শমেসপুর গ্রামে এক বাড়িতে রেখে এসেছি। আগামী কাল সে তোমার কাছে আসবে।’
ঐ এ্যাম্বুসে যুদ্ধ হয় নাই। কমান্ডার স্যার ক্রোলিং করে রেল লাইনে বৈদ্যুতিক মাইন বসিয়ে এসেছিলেন। কমান্ডার স্যার ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন। আমরা ধানক্ষেতের মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকলাম। কামান্ডার স্যারের হাতে মাইনের তার ও ব্যাটারী। টর্চ লাইট ও হ্যারিকেন হাতে পাকি মিলি শিয়া ও রাজাকারেরা ষ্টেশনে টহল দিচ্ছিল। ওদের পায়ে লেগে হঠাৎ আমাদের মাইনের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মাইনটি ওদের নজরে পড়লো। হুইসেল দিয়ে

রাজাকারদের লাইং পজিশনে রেডি থাকতে বললো। আমাদের দিকে টর্চ লাইট মেরে মেরে খুঁজতে থাকলো আর উর্দূতে বকাবকি করতে থাকলো। ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জ গামী পাকি হানাদার বাহী একটি ট্রেন এলো। ষ্টেশনের পাকি হানাদারেরা সিগন্যাল দিল। ষ্টেশনে ট্রেনটি থামিয়ে দিল। ট্রেনের পাকি হানাদারেরা অস্ত্র তাক করা অবস্থায় নেমে আমাদেরকে খুঁজতে থাকলো।

মাইনের বৈদ্যুতিক তার বিছিন্ন হয়ে পরায়। আমাদের মাইনটি ব্রাষ্ট করা সম্ভব হলো না। পাকি হানাদারদের সংখ্যাধিক্যতায় ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে কমান্ডার স্যার উইথড্র হওয়ার কমান্ড করলেন। আমরা কিছু দুল ক্রোলিং করে পিছিয়ে এসে উইথড্র হয়ে কমান্ডার স্যারের বাড়ি বেলকুচি থানার তামাই গ্রামে এলাম। পরের দিন সিরাজগঞ্জ থেকে পাকি হানাদার ও রাজাকারেরা এসে কালিয়া হরিপুর ও পাশর্^বতী কয়েকটি গ্রামের কয়েকটি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। কিছু লোকের উপর নিযার্তন চালিয়ে ছিল। আমরা কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন এ্যাম্বুস থেকে ফিরে এসে তামাই গ্রামে কমান্ডার স্যারের বাড়িতে একত্রিত হই। কমান্ডার স্যারের মা আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

আমরা কমান্ডার স্যারের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের সবাইকে বসিয়ে কমান্ডার স্যার ব্রিফ করলেন। স্থানীয় ভাবে ট্রেনিং দেওয়া বেশ কিছু যুবককে আমাদের গ্রুপে ভর্তি করা হয়েছিল। এত বড় প্লাটুন এক শেল্টারে শেল্টার নেওয়া সমস্যা। তাই কমান্ডার স্যার ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী কে কমান্ডার করে আমাদের ৬৬ জনের আর একটি গ্রুপ করে দিলেন। আমরা সারারাত হেঁটে বেলকুচি থানার কল্যানপুর এলাম।

৩। কল্যাণপুর যুদ্ধ: কল্যাণপুর সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার একটি গ্রাম। ৫ নভেম্বর’৭৬ কল্যানপুর গ্রামে একটি যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী। কমান্ডার স্যারের নির্দেশে আমরা ৬৬ জন রবীন্দ্র নাথ বাগ্চীর কমান্ডনাধীন হয়ে হেঁটে ভোরে বেলকুচি উপজেলার কল্যাণপুর নামক গ্রামে এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। বাড়ির মালিক আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা সারারাত নিদ্রাহীন থেকেও হেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

সকালের খাবার খেয়ে প্রকাশ্যে পিটি, প্যারেড করলাম। অস্ত্র পরিষ্কার করলাম। অস্ত্রে ফুলথ্রু মারলাম। একজন করে করে আমাদের অবস্থান পাহাড়া দিতে থাকলাম। অন্যান্যরা কেহ কেহ ঘুম বা রেষ্টে থাকলাম। কল্যানপুর একটি নিভৃত গ্রাম। আমাদের ধারনা ছিল এই গ্রামে পাকি হানাদার ও রাজাকার আসবে না। বেলা ১০টার দিকে সেন্ট্রিরত সহযোদ্ধা রতনকুমার দাস দৌড়ে এসে জানালেন আমদের কে ধরার জন্য বেলকুচি থানা থেকে কয়েকজন পাকি হানাদার মিলে শিয়া ও রাজাকার আসছে।

বওড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কল্যানপুরের দিকে আসছে। দুইজন পাকিস্তানি দালাল গামছা দিয়ে মুখ বেধে নিয়ে হানাদার ও রাজাকারদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছে। দূর থেকে অনুমান হলো এই দলে ৫জন মিলেশিয়া ও ৪ জন রাজাকার আছে। আমাদের কমান্ডার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা কল্যানপুর গ্রামের রাস্তার ধারে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে পজিশন নিলাম। বাঁশ ঝাড়ের সামনে দিয়ে চলা রাস্তা ধরে পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকারেরা আসছিল। আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসার সাথে সাথে আমাদের কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী কমান্ড ও ফায়ার ওপেন করলেন। আমরা এক যোগে গুলি করা শুরু করলাম। এক লাফে হানাদারেরা রাস্তার উত্তর পার্শে¦ পজিশন নিল। ওরাও আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালালো। আমরাও একযোগে বৃষ্টির মতো গুলি ছাড়তে থাকলাম। গোলাগুলির শব্দ পেয়ে আশে পাশে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ আমাদেরকে সহযোগীতা করার জন্য এগিয়ে এলেন।

প্রায় এক ঘণ্টার মত সময় সম্মুখ যুদ্ধ চললো। তারপর পাকি হানাদারেরা পিছিয়ে গেল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা বিজয় উল্লাস করলাম। সকল স্তরের মানুষের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। এক বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপর হেটে দৌলতপুর গ্রামের সহযোদ্ধা মুক্তি মো. শামসুল হকের বাড়িতে শেল্টার নিলাম। ১৪ নভেম্বর'৭১ এই শেল্টারে আমার মেজো দাদা সমরেন্দ্র নাথ সান্যাল আমাদের সাথে যোগ দিলেন। আমরা কয়েক দিন দৌলতপুর, তেঞাশিয়া, খুকনী, বাজিয়ারপাড়া, দরগার চর ও অন্যান্য গ্রামে থাকতে থাকলাম।

৪। ধীতপুর যুদ্ধ:ধীতপুর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগ্চী। ডিসেম্বর'৭১ মাসের প্রথম সপ্তাহের পর আমরা শেল্টার নিলাম সৈয়দপুর গ্রামের কালা চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্যদের বাড়িতে। গত কয়েক দিন হলো আমাদের গ্রুপ ও অন্যান্য আরো কয়েকটি গ্রুপ সৈয়দপুর ও আশেপাশের গ্রামে অবস্থান করছি।

১২ ডিসেম্বর'৭১ জামিরতা গ্রামের অধিবাসী বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচীর নিয়ন্ত্রনাধীন আমাদের গ্রুপটি ছিল জালালপুর ইউনিয়নাধীন সৈয়দপুর গ্রামের কালাচাঁদ চক্রবর্তী ও অন্যান্যের বাড়ীতে। ১৩ ডিসেম্বর'৭১ ছিল আমাদের গ্রুপের শেষ রণাঙ্গনের যুদ্ধ। স্থানটি ছিল সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার সনাতনী ইউনিয়নের ধীতপুর নামক গ্রামের ওয়াপদা বাঁধে। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী। ১৩ ডিসেম্বর'৭১ সংবাদ পেলাম পাকি হানাদারেরা কৈজুরী হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইলের যুদ্ধে পাকিহানাদারেরা পরাজিত হয়ে লঞ্চে যমুনা নদী পাড় হয়ে মালি পাড়া রাজাকার ক্যাম্পে এসেছে। মালিপাড়া রাজাকার ক্যাম্প থেকে রাস্তা চিনানোর জন্য দুই জন রাজাকার কে সঙ্গে নিয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর সকাল ১১টার দিকে আমাদের শেল্টারে ২, ৩ জন যুবক দৌড়াতে দৌড়াতে হাপিয়ে এসে বললো, 'পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছে,

আপনারা শালাদের ধরুন।'

আমরা পাকি হানাদারদের অনুসরন করার জন্য ওদের পিছু নিলাম। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা কৈজুরী গ্রামের এক মুলা খেত থেকে মুলা তুলে খাওয়ার চেষ্টা করলো। ওরা জানতনা কাঁচামুলা খাওয়া যায় না। সম্ভবত ওরা ছিলো খুব ক্ষুধার্ত।ওয়াপদা বাঁধ ধরে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা অগ্রসর হতে লাগলো। আমরাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের ফলো করতে থাকলাম। ওরা ভীষণ ক্রোধী। ধীতপুর নামক স্থানে গিয়েওরা আমাদের দিকে অস্ত্র তাককরে গুলিকরলো। আমরা জাম্পকরে ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিম দিকে পজিশন নিলাম। ওদের উপর গুলি ছুড়তে শুরু করলাম। ওরাও ওয়াপদা বাঁধের পূর্ব পার্শ্বে পজিশন নিল।

পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কি ভয়াবহ যুদ্ধ। প্রায় এক ঘণ্টার মত গুলিপাল্টা গুলি চলতে থাকলো। গুলির শব্দে শাহজাদপুর থানার মো. সিরাজুল ইসলাম এর গ্রুপ ও অন্যান্যগ্রুপ, বেড়া থানার এসএম আমির হোসেনের গ্রুপ ও অন্যান্য গ্রুপ। বেলকুচি ও চৌহালী থানার বিভিন্ন গ্রুপ আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলো। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। অন্ধকার হয়ে এলো হানাদারেরা গুলি করা বন্ধ করলো। আমরাও অন্ধকারে প্রায় গুলি করা বন্ধ করলাম। সারারাত আমরা না খেয়ে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। আমাদের গ্রুপটি ছিল বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীন। যুদ্ধটি ছিল ভীষন ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ। তথা কথিত হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ।

হয় যুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে অন্যথায় সবার জীবন যাবে। আমাদের গ্রুপটি ছিল ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিম দিকে উত্তর পাশে এনায়েতপুরের মো. বজলুল করিম দুলালের গ্রুপের ডান পাশে। আমার বাম পাশে অবস্থান ছিল আমার গ্রুপ কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগচীর। তিনি এল.এম. জি চালাচ্ছিলেন। তার ডান পাশে ছিলাম আমি। আমি থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালাচ্ছিলাম। আমার ডান পাশে ছিলেন আমার মেজ দাদা সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল। তিনি থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালাচ্ছিলেন। আমার মেজ দাদার ডান পাশে ছিল কাদাই বাদলা গ্রামের মো. নজরুল ইসলাম, দৌলতপুর গ্রামের মো. শামছুল হক, মীর কুটিয়া চরের মো. নজরুল ইসলাম ও অন্যান্যরা। আমাদের গ্রুপের ডান দিকেই ছিল বেড়ার এস এম আমির হোসেনের গ্রুপ। তুমুল যুদ্ধ। দুটি গুলি এসে আমার হেলমেটে লাগলো। এস এম আমির হোসেন সাহেবের গ্রুপের মো.আব্দুল খালেক ও মো. আমজাদ হোসেন গুলি বিদ্ধ হলেন।

আমাদের পাশেই দুই জনই যন্ত্রনায় কাতরা ছিলেন। আমাদের সবার মন খারাপ। পাশের্^র কয়েক জন তাঁদের সেবা করছেন। আমাদের কোন অবস্থাতেই গুলি করা বন্ধ করা যাবে না। আমরা সবাই গুলি চালিয়ে যাচ্ছি। আমি থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে গুলি চালাচ্ছি। এর মধ্যে সন্ধ্যা ও অন্ধকার নেমেএলো। রাতে ধীতপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাছ থেকে মাঝেমাঝে ২/১

টাকরে গুলি আসছিল। ওদের গুলির প্রেক্ষিতে আমরাও ২/১টাকরে গুলি করছিলাম। ভোরে ফর্সা হলে আমাদের কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগচী ও বেড়ার কমান্ডার জনাব এস.এম আমির হোসেন ও অন্যান্যরা ক্রোলিং করে ধীতপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের দিকে গিয়ে দেখা গেল। দুই জন রাজাকার সারা রাত কভারিং ফায়ার করেছে। কমান্ড করে রাজাকার দুই জনকে স্যারেন্ডার করালেন। তারা দুই জন আত্মসমর্পণ করলো। রাজাকার দুই জনের নাম ছিল লতিফ ও কালাম। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে নেওয়াহলো। তাদের কাছ থেকে জানা গেল রাত ১১ টার দিকে পাকিস্তানি সৈন্যেরা ক্রোলিং করে নিরাপদ দুরত্বে এসে হেঁটে বেড়া নদী পার হয়ে ঢাকা যাবার উদ্দেশ্যে পালিয়েছে। পরে জানা গেল। পাকি হানাদারেরা বেড়া ঘাটে গিয়ে ভেড়া কোলা গ্রামের হলদারদের নৌকায় নদীপাড় হয়ে নগর বাড়ি ঘাট হয়ে ঢাকা যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

ধীতপুরের যুদ্ধে বেড়ার এস. এম.আমির হোসেনের গ্রুপের বৃশালিখা গ্রামের অধিবাসী বেড়া বিবি হাই স্কুলের দশম শ্রেনীর ছাত্র জনাব মো. আব্দুল খালেক ও ছেচানিয়া গ্রামের আমজাদ হোসেন গুলিবিদ্ধ হন।দুই জনই গুরুতর আহত। দুইজনই পরে শহীদ হয়েছেন। আমাদের অন্যান্য গ্রুপের ৪ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছেন। স্থানীয় দুজন পথচারী গোলা গুলির সময়ে গুলি লেগে ওয়াপদাবাঁধের উপর মারা গিয়েছেন। ধীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা জামিরতাহাই স্কুলে ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়ে ছিলাম। ১৪ ডিসেম্বর'৭১ শাহজাদপুর থানা হানাদারমুক্ত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ৭১ তিরা নব্বই হাজারাধিক পাকিস্তানি সৈন্যের পক্ষে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে(তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে) মাথানিচু করে আত্মসমর্পন করে। আমাদের মহান মুক্তি যুদ্ধের বিজয় অর্জন হয়। মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসন গড়ে উঠে। মো. আব্দুল বাকি মির্জা শাহজাদপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক ও থানা প্রশাসক মনোনীত হন। তিনি সিও (ডেভ) অফিসে বসতেন। শাহজাদপুর থেকে সারা উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত খরচ বহন করতেন।

১৯ ডিসেম্বর ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট ও সেনা বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান এর কাছ থেকে জোর করে ক্ষমতা কেড়ে নেয় জুলফিকর আলী ভুট্টো। তিনি ৮ জানুয়ারী'৭২ আমাদের জাতির পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। জাতির পিতা ঐ দিনই লাহোর থেকে সকালে বিমানে যাত্রা করে বিকালে অবরতরণ করেন ইংল্যান্ডের হিব্রো বিমান বন্দরে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বাঙালিদের জাতির পিতাকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে সংবর্ধনা দেন। জাতির পিতা ১০ জানুয়ারী ব্রিটিশের বিশেষ বিমান যোগে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাংলাদেশে আসার পথে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রনে ভারতে যাত্রা বিরতি করেন। তারপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে আসলেন।

১২ জানুয়ারী জাতির পিতা প্রথমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং পরক্ষণেই রাষ্ট্রপতি পদের ইস্তেফা দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথা চালু করে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে দেশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। জাতির পিতা আমাদেরকে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের গ্রুপ ২৪ জানুয়ারী'৭২ রবিবার সিরাজগঞ্জ সদরস্থ ইব্রাহিম বিহারীর বাসায় অস্থায়ী অস্ত্র জমা নেওয়ার ক্যাম্পে আঞ্চলিক অধিনায়ক মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ ও হাতকাটা আর্মি অফিসার জনাব মো. সাইফুল্লাহ এর সম্মুখে অস্ত্র জমা নেওয়ার ক্যাম্পে অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করলাম। খালি হাতে আমরা দুই সহোদয় একত্রে বাড়িতে চলে এলাম। সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের পুণর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্প করা হলো। আমরা ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি হলাম না। ভারতের শরনার্থী ক্যাম্প থেকে আমাদের বাবা মা ও পরিবারের সবাই স্বাধীন দেশে ফিরে এলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী'৭২ সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বকেয়া রেশনিং ও পকেট এ্যালাউন্স হিসাবে ১৬০ টাকা, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ও সমানী স্বাক্ষরিত সনদ নং-১২৯১৫ ও একটি সাদা কম্বল দিলেন। কয়েক দিন পর রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল এর কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণীর অটোপাশের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর বহুপাশির্^ক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে লেখা পড়া শুরু করলাম।

PREVIOUS ARTICLE

অদম্য কিশোর : শিবুকান্তি দাশ

NEXT ARTICLE

অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে : সেলিনা হোসেন (সাক্ষাৎকার)

এ বিষয়ে আরও লেখা

অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে : সেলিনা হোসেন (সাক্ষাৎকার)

ADD A COMMENT

সাম্প্রতিক লেখা

অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে : সেলিনা হোসেন (সাক্ষাৎকার)

আমার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কথা : দেবেশ চন্দ্র সান্যাল (স্মৃতিচারণ)

অদম্য কিশোর : শিবুকান্তি দাশ

ছদ্মবেশী : শারমিন প্রিয়া

অধিকার : অমল বিশ্বাস

খোকন সোনা : মুহাম্মদ নূর ইসলাম

ভুলে যেতে : মো. আমজাদ হোসেন

বাহাদুরি : বিজন বেপারী

চিরচেনা নাট্যমন্দির রোড! : আজমির রহমান রিশাদ

মুখ মুখোশের আড়ালে : মুহিতুল ইসলাম মুন্না

বেওয়ারিশ সম্পর্ক : বিপ্লব হোসেন

সোনা মোড়ানো নুড়ি পাথর : মুসলেহা সুলতানা

অভিমানী আমি : নাজমুন নাহার লাভলী

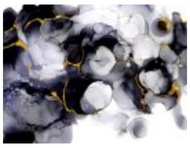

অনুরক্তি : মো. জয়নুল ইসলাম

তোমাকে পাওয়ার জন্য হে সফলতা : প্রহ্লাদ কুমার প্রভাস

দান : আফছানা খানম অথৈ

রোজা : রুমানা আক্তার রত্না

মানুষ : নিহাদ হোসাইন

ভাঙা চুড়ি : নয়ন আলী নাঈম

স্মৃতির সারথি : ইয়াছিন আরাফাত

আমাদের সম্পর্কে

সূর্যাক্ষর বাংলাদেশের একটি উদিয়মান প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার বই প্রকাশের পাশাপাশি আমরা লিটলম্যাগ প্রকাশ করি। লিটলম্যাগের ক্ষেত্রে আমাদের দুটি মাধ্যম আছে। একটি অনলাইন পোর্টাল, আরেকটি ছাপা ম্যাগাজিন।

যোগাযোগ

- ঠিকানা: ৭৯/২/বি, ৯ নং লেন, কদমতলা, বাসাবো, ঢাকা-১২১৪
- মোবাইল: ০১৭৩৭৭২৪০৬৯, ০১৭৮২৩৭৯৮৩৭
- ইমেইল: surjakkhor@gmail.com
- ফেইসবুক গ্রুপ: www.facebook.com/groups/surjakkhor

লেখা আহ্বান

প্রবন্ধ, ছড়া-কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য সমালোচনা, অনুবাদ, ভ্রমণকাহিনি, চলমান ইস্যু নিয়ে আলোচনাসহ যেকোনো ধরনের লেখা পাঠানো যাবে। প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের একেকটা পর্ব কমপক্ষে এক হাজার শব্দের হতে হবে। কবিতায় শব্দ সংখ্যার সীমা নেই। তবে কমপক্ষে ১০/১২ লাইনের হলে ভালো হয়, ছোট হলে ছাপানো হবে না, এমনটা নয়। বড় হলেও চলবে। ই-মেইল: surjakkhor@gmail.com

কপিরাইট © সূর্যাক্ষর প্রকাশনী | গোপনীয়তা নীতি | শর্তাবলি ও নীতিমালা